ক লা ভ ব ন
উদ্ভব পুনরুজ্জীবন শতবর্ষ

পুলক দত্ত

শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা নিয়ে ছাতিম গাছ, কঙ্কাল, ভুবনডাঙার ডাকাতের দল, দ্বারিক সর্দার ইত্যাদি নানান গপ্পো বহুদিন ধরে মুখে মুখে ও লিখিত ইতিহাস আকারে নথিভুক্ত হয়ে আছে।[1] অথচ এরই পাশাপাশি লুকিয়ে আছে এই অঞ্চলের আরেক প্রামাণ্য ইতিহাস : বীরভূমে তন্ত্র সাধনার ধারা, তন্ত্র সাধনার উপকরণ হিসেবে ছাতিম ; ডাকাত বা দস্যুর সঙ্গে সম্পর্কহীন করোটি (নরকঙ্কাল নয়) ইত্যাদির ব্যবহার ; নির্জন এই ছাতিমতলায় বামাচারী কোনও তান্ত্রিকের সাধনার আসন পাতার সম্ভাবনা - এই সবই সেই ইতিহাসের অঙ্গ।[2]

ট্রেনে কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতন আসার পথে দুই বন্ধুর এক সরস কথোপকথন মনে করাল এই ইতিহাস লেখার ইতিহাসের কথা। কথাবার্তায় ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকে তাদের পরিচয় : মেয়েটি সদ্য কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ থেকে পাস করে বেরিয়েছে আর ছেলেটি

---

[1] অজিতকুমার চক্রবর্তী, ‘প্রব্রজ্যা - শেষ বয়সের সাধনা - শান্তিনিকেতন-আশ্রম প্রতিষ্ঠা - হিমালয়ে যাত্রা’, *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ,* ইন্ডিয়ান প্রেস, ইলাহাবাদ। ১৯১৬ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আশ্রমের রূপ ও বিকাশ,* বিশ্বভারতী, কলিকাতা। ১৯৫১ দ্রষ্টব্য।

[2] অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *শান্তিনিকেতন আশ্রম,* থ্যাকার স্পিঙ্ক, কলিকাতা। ১৩৫৭ [১৯৫০] দ্রষ্টব্য।

শান্তিনিকেতনের কলাভবনের পাঠ শেষ করেছে কয়েক বছর আগেই। চনমনে দুটি শরীরে ফুটে বেরোতে থাকে তাদের বন্ধুত্বের গাঢ়তার সৌন্দর্য ; তাদের কথপোকথন সকল সহযাত্রীদের কাছে হয়ে ওঠে উপভোগ্য। আসছে দু'জন শান্তিনিকেতন কলাভবনের শতবর্ষ উপলক্ষে অনুষ্ঠিতব্য উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আর মেয়েটি এই কলাভবনকে ঘিরেই সরস অথচ অপ্রস্তুতকর কিছু প্রশ্ন করে চলেছে তার বন্ধুকে, বন্ধু হাসি মুখে উত্তর দেবার চেষ্টা করছে।

কলাভবন

বিশ্বভারতীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ২৩ ডিসেম্বর ১৯১৮, এ-কথা সকলের জানা। বিশ্বভারতীর কার্যারম্ভ ৩ জুলাই ১৯১৯, ১৯২১ সালের ২৩ ডিসেম্বর আম্রকুঞ্জে বিশ্বভারতীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন আর ১৬ মে ১৯২২ সালে এর রেজিস্ট্রেশন সম্পাদিত হয়। 'বিশ্বভারতী যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারতীয় সঙ্গীত ও চিত্রকলা শিক্ষা তাহার প্রধান অঙ্গ হইবে এই আমাদের সঙ্কল্প হউক।'[3] রবীন্দ্রনাথের এই সঙ্কল্প অনুযায়ী ভারতীয় সঙ্গীত ও চিত্রকলা শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে দ্বারিক বাড়ির ওপর তলায় ১৯১৯ সালে কলাভবনের জন্ম। ১৯২১ সালে *শান্তিনিকেতন* পত্রিকায় বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য ও শিক্ষাকাঠামো সম্বন্ধে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় তাতে চিত্রকলার শিক্ষাক্রম ও কাঠামো সম্বন্ধে বলা হয়, '(18) The course to be followed in this department is of not less than six years, and it will be divided into two parts, the first being for general efficiency and the second for higher efficiency. (19) Instruction in Drawing and Painting is given here according to the Indian School of Art. There is an Art Gallery as well as an Art Library attached to this

---

[3] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কলাবিদ্যা', *শান্তিনিকেতন পত্রিকা,* ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা। অগ্রহায়ণ ১৩২৬ [১৯১৯]

department.’[4]

‘ভারতীয় চিত্রকলা’ বলতে রবীন্দ্রনাথ ঠিক কী বুঝতেন বা ‘Indian School of Art’ বলতে বিজ্ঞপ্তিতে ঠিক কী বোঝানো হয়েছে, সেটার একটা আভাস না পেলে এই শিক্ষা কাঠামোটিকে হয়ত ভুল বোঝার সম্ভাবনা থেকে যায়। ‘ভারতীয়’ কথাটি এখানে একটি বিশেষ যাপনসম্পৃক্ত ‘চর্চা’ বলে মনে হওয়ার কারণ আছে - চিত্রকলার বাহ্যিক রূপ ও বিষয়কে অতীত ভারতীয় শিল্পের অবয়বের ছাঁচে ফেলে শিল্পবস্তু ‘উৎপাদন’ ও তার প্রদর্শন এর অর্থ নয় নিশ্চয়ই। এই কলাভবনের উদ্যোগকে নেতৃত্ব দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ নন্দলালকে আহ্বান জানান। সেই সূত্রে নন্দলালের গুরু অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যে পত্রালাপ হয়, সেখানে রবীন্দ্রনাথ জানান, ‘নন্দলাল এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন - বাহির থেকে তার উপরে কোনো দায়িত্ব চাপানো হয় নি - তা ছাড়া এখানে তার নিজের কাজের ব্যাঘাত করবার কোনো প্রকার উপসর্গ নেই। আরো একটি সুবিধা এই, এখানে সংস্কৃত ও ইংরাজি সাহিত্য-চর্চায় নন্দলাল যোগ দেওয়ায় মনের মধ্যে সে যে একটি নিয়ত আনন্দ লাভ করছে সেটা কি তার প্রতিভার বিকাশে কাজ করবে না ? তোমাদের সোসাইটি প্রধানত চিত্রপ্রদর্শনীর জন্যে - এখান থেকে তার ব্যাঘাত না হয়ে বরঞ্চ আনুকুল্যই হবে।’[5] এই ‘প্রধানত চিত্রপ্রদর্শনী’-র জন্য সোসাইটি গঠনের ধারাটি আজও সক্রিয়। তার সঙ্গে কলাভবনের একটা স্পষ্ট পার্থক্য, এমনকী বিরুদ্ধতাও এই চিঠিটির মেজাজে সঞ্চারিত। ‘ভারতীয়’, এই ধারণাটি তাই **১৯১৯** সালের রবীন্দ্রনাথের কাছে ‘চর্চা’-কেন্দ্রিক ; ‘উৎপাদন’ অথবা ‘প্রধানত চিত্রপ্রদর্শনী’-কেন্দ্রিক নয়।

এই বিভাগের অন্যতম প্রথম দুই ছাত্র, ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্ম্মা ও বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় কলাভবনের উদ্দেশ্য, শিক্ষাপ্রণালী, শেখার

---

4 Bidhushekhar Bhattacharya, ‘The Visva Bharati: “Yatra visvam bhavatyekanidam”’, *Santiniketan* (Vol. II, Issue 10, Magh, 1327 [1921]). p. 579

5 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্র, **১৯১৯**। রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন।

পরিবেশ ইত্যাদি নিয়ে তাঁদের স্মৃতিকথা ও অন্যান্য রচনায় আলোচনা করেছেন। সেই কলাভবনে পাঠ্যক্রম-পরীক্ষার যেমন প্রয়োজন হয়নি শিক্ষার্থীদের শেখার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে, জীবনযাপনের স্বাভাবিক গতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ‘নেচার স্টাডি’, ‘স্টিল লাইফ’, ‘নিউড স্টাডি’, ‘কম্পোজিশন’ ইত্যাদির চর্চাও ছিল তেমন অশ্রদ্ধেয়। আর্ট কলেজ হয়ে কারখানার মত প্রতি বছর পেশাদার শিল্পী ও সরকারী কেরানি তৈরি করার জন্য কলাভবন প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কলাভবন একটি শিল্পচর্চাকেন্দ্র হয়েই বিকশিত হতে চেয়েছিল, চিত্রপ্রদর্শনী যার ক্ষুদ্র একটি অংশ ; প্রথমদিকের কলাভবনের বর্ণনা তারই ইঙ্গিত দেয়। ছাত্রছাত্রীরা এখানে শিল্পী হিসেবেই বিবেচিত হতেন ; শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিভাজন প্রকট হয়ে ওঠেনি এখানে তখনও। দিন-রাত্রি অবারিত দ্বারিক বাড়িতে ধারাবাহিক সৃজনক্রিয়ায় আনন্দময় হয়ে উঠত পরিবেশ ; খণ্ডিত, কাটা-কাটা সময় নিয়ে এখানে চলত না কোনও ভাঙা ভাঙা শিল্প-আঙ্গিকের পাঠ। অন্যদিকে, দৈহিক শ্রম আর ভারতীয় শিল্পতত্ত্বের বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে গড়ে তুলেছিল এক পাল্টা ভারতবোধ।

শতবর্ষের রগড়

‘আরে সে না হয় বোঝা গেল কিন্তু যে-শিল্পপ্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র দুটি পাতে দেওয়ার মত শিল্পী প্রসব করে, এত ঘটা করে তার শতবর্ষ উদযাপন ?’ মেয়েটির এই প্রশ্নের উত্তরে ছেলেটি যখন, ‘আহা, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, আসলে ঘটনা হল …’ ইত্যাদি বলে ব্যাপারটা ম্যানেজ করার চেষ্টা করছে, মেয়েটি তখন বলে চলেছে, ‘কিন্তু কলাভবন বললেই যখন গৌর-নিতাইয়ের মতন দুটি নাম, বিনোদবিহারী আর রামকিঙ্কর ঘুরে বেড়ায় তোদের মুখে মুখে তখন আমরা মুচকি হাসি চাপতে পারিনা।’ মনে হ’ল ছেলেটি যেন একটু বিরক্ত, ‘কিন্তু এটাই তো গোটা গপ্পো নয়। আর মুশকিল হ’ল শিল্পী

ও শিল্প ঐতিহাসিক হিসেবে পরিচিত যে-শিল্পপ্রশাসক গোষ্ঠী সূক্ষ্ম চাতুর্যে এই গপ্পোটি তৈরি করল, তোরা যে শুধু তাদের কথাই শুনিস।'

একজনকে মহিমাণ্বিত করতে আরেকজনকে ছোটো করার কৌশল ইতিহাস লেখার একটি প্রবণতা। যে-দ্বারিক বাড়ির দোতলায় কলাভবনের প্রতিষ্ঠা তার সঙ্গে দ্বারিক সর্দারের সম্পর্কের কথা ভুলেছি অথচ দ্বারিক, ডাকাত দলের সর্দার ছিল আর দেবেন্দ্রনাথের যাদুতে ডাকাতি ছেড়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে আশ্রমের প্রহরীর কাজ করত এমন কথা প্রচার করে চলেছি।[6] ভুলেই গেছি যে দেবেন্দ্রনাথের অনুরোধে মানকরের জমিদার দ্বারিক সর্দারকে প্রহরীর কাজে আশ্রমে পাঠান। তিনি এই কাজে নিযুক্ত হয়ে তাঁর পরিবার নিয়ে ভুবনডাঙায় বসবাস করতেন ; তাঁর পরিবারের সদস্যেরা আজও ভুবনডাঙায় বসবাস করেন। দ্বারিক সর্দার বা ভুবনডাঙা গ্রামের সঙ্গে ডাকাত বা ডাকাতির সম্পর্ক নিয়ে কোনও বিশ্বাসযোগ্য তথ্যপ্রমাণ আজও নেই, উল্টোটাই আছে। দ্বারিক বাড়ি নির্মিত হলে তিনি এখানেই থাকতেন ও আশ্রমে প্রহরীর কাজ করতেন।[7]

ছেলেটি বলে চলল, 'এই বাড়ি পরে দোতলা হয় আর এখানেই কলাভবনের জন্ম। নন্দলাল বলেন কলাভবন ক্রমাগত পুব থেকে পশ্চিমে সরে এসেছে : দ্বারিক - সন্তোষালয় - লাইব্রেরির দোতলা - নন্দন।[8] আবার

---

[6] 'শান্তিনিকেতনের সামনে ভুবনডাঙা গ্রাম, সে গ্রামে থাকত এক ডাকাত দল। ... কত লোককে যে তাহারা খুন করিয়া ঐ ছাতিম গাছ তলায় তাহাদিগের মৃতদেহ পুঁতিয়া রাখিয়াছিল, তাহার ঠিকানা নাই। দেবেন্দ্রনাথের কাছে সেই ডাকাতের দলের সর্দার ধরা দিল ; ডাকাতি ব্যবসায় ছাড়িয়া তাঁহার সেবায় সে আপনাকে নিযুক্ত করিল।' অজিতকুমার চক্রবর্তী, *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ*, ইন্ডিয়ান প্রেস, ইলাহাবাদ, ১৯১৬। পৃ. ৪৪২

[7] শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রথম আশ্রমধারী লিখছেন, ১২৯০ [১৮৮৩] সালে 'আমি বোলপুরে বাস করিতাম, ভুবনডাঙ্গার ন্যায় ক্ষুদ্র পল্লীতে ডাকাইতদলের বাস ছিল শুনি নাই। ... আর দ্বারিক সর্দ্দার "ডাকাতের দলের সর্দ্দার" রূপে ধরা দেয় নাই, চাকরী করিতে আসিয়া ভুবনডাঙ্গায় বাস করিয়াছিল।' অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় 'শান্তিনিকেতনের স্মৃতি', অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *শান্তিনিকেতন আশ্রম,* থ্যাকার স্পিঙ্ক, কলিকাতা। ১৩৫৭ [১৯৫০] পৃ. ১৭। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, বুদ্ধদেব আচার্য, 'রূপান্তরে শান্তিনিকেতন', তপনকুমার সোম (সম্পাঃ), *রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন,* দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১০। পৃ. ১৫-৬২

[8] 'দেখ, পুব থেকে পরপর আমাদের কলাভবনের গতি হচ্ছে পশ্চিমে।' পঞ্চানন মণ্ডল, *ভারতশিল্পী নন্দলাল,* ২য় খণ্ড, রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ, শান্তিনিকেতন, ১৯৮৪। পৃ. ১০০

তারও পরবর্তীকালে কলাভবন সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে উত্তর দিকে, ষাটের দশকে নির্মিত নবনন্দন হয়ে সম্প্রতি সে আশ্রয় পেয়েছে আরও উত্তরে মালঞ্চের পিছনে লালবাঁধের দক্ষিণে ; কলাভবনের এই পুব থেকে পশ্চিমে যাত্রার গতিটা কেমন রূপকধর্মী মনে হয়। কেবল ভৌগোলিক দিক থেকেই কলাভবনের যাত্রা পশ্চিমমুখী হয়েছে এমন নয় ; হাবে-ভাবে, মেজাজে-আঙ্গিকে, মানসিকতা-দৃষ্টিভঙ্গীতেও সে হয়ে উঠেছে ক্রমাগত পশ্চিমমুখী।'

কলাভবনের পথচলা শুরুর বছর দুয়েক পর ২১ ডিসেম্বর ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে হাঙ্গেরিয়ান শিল্পসমালোচক পঁচিশ বছর বয়সী স্টেলা ক্রামরিশ শান্তিনিকেতন পৌঁছন। পরবর্তী দু বছর তিনি শান্তিনিকেতনে থাকেন ও কলাভবনে পাশ্চাত্য শিল্পের উদ্দেশ্য আঙ্গিক ও নান্দনিক অবস্থান সম্পর্কিত তাঁর বক্তৃতামালা উপস্থাপন করেন। স্টেলা এখানে প্রাচ্যশিল্প বিষয়েও বক্তৃতা করেন।[9] তবে তৎকালীন ছাত্রদের স্মৃতিচারণায় বোঝা যায় ইয়োরোপিয় আধুনিক শিল্পের আলোচনা তাঁরা সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেন ; এর প্রধান কারণ হয়ত এই যে এই বিষয়ে ভারতবর্ষীয় শিল্পী সামাজ তখনও অবহিত ছিল না। আবার এও লক্ষ করা যায় যে কলাভবনের আদর্শ, শিক্ষাপদ্ধতি, উদ্দেশ্য ইত্যাদি স্টেলা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারেন নি। নন্দলালের কথাবার্তায় এবং অসিতকুমার হালদারের লেখা পড়ে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে প্রথমদিকে স্টেলার অর্থাৎ পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে বিশ্বভারতীর আদর্শের সংঘাত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের কাজ তাঁর পছন্দ না হওয়ায় তিনি তাঁদের নানান উপদেশ দিতে থাকেন ; স্বাভাবিকভাবেই পাশ্চাত্য অর্থাৎ আধুনিক শিল্পতত্ত্ব ও তার শ্রেষ্ঠত্বের দাবি নন্দলালের কাছে

[9] 'বিশ্বভারতীর চিত্রকলার অধ্যাপকদিগের সহিত তিনি (অষ্ট্রিয়াবাসিনী ডাঃ মিস [স্টেলা] ক্র্যামরিশ) বর্ত্তমানে য়ুরোপীয় চিত্রকলার বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত আছেন।' *শান্তিনিকেতন,* মাঘ ১৩২৮ (১৯২২) 'ডাঃ স্টেলা ক্র্যামরিশ শিল্পকলা সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতেছেন। প্রাগৈহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মিশর, এসিরিয়া, গ্রীস ও ইতালির শিল্পকলার বিষয় পর্য্যন্ত বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছে। ক্রমে তিনি মধ্য এশিয়া, চীন, জাপান ও ভারতবর্ষের শিল্পকলা সম্বন্ধে বলিবেন।' *শান্তিনিকেতন,* ফাল্গুন ১৩২৮ (১৯২২)

গ্রহণযোগ্য ছিল না।[10]

স্টেলা যেদিন সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতন পৌঁছন তার দু’দিন পর, ৮ই পৌষ ১৩২৮ (২৩ ডিসেম্বর ১৯২১) আম্রকুঞ্জে একটি অনুষ্ঠানে বিশ্বভারতীকে রবীন্দ্রনাথ সর্বসাধাণের হাতে সমর্পণ করেন। বিশ্বভারতী-পরিষদের এই প্রতিষ্ঠা সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্রজেন্দ্রলাল শীল ; দু’জনেই বিশ্বভারতীর আদর্শ ও উদ্দেশ্য সভাস্থ সকলের সামনে পেশ করেন।[11] সভায় গৃহীত প্রস্তাব পরবর্তীকালে পরিবর্তিত পরিবর্দ্ধিত হয়ে বিশ্বভারতীর সংবিধান হিসেবে রেজিস্ট্রিকৃত হয়। অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে সেদিন স্টেলাও উপস্থিত ছিলেন এই সভায় - কাজেই বিশ্বভারতীর আদর্শ তাঁর অজানা ছিল না নিশ্চয়ই। এই সভা অনুষ্ঠিত হবার কিছু দিনের মধ্যেই কলাভবনের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের কাছে স্টেলা তাঁর বক্তৃতামালা উপস্থাপন করতে শুরু করেন।

প্রতিষ্ঠাকালেই বিশ্বভারতীকে প্রাচ্যবিদ্যার একটি প্রধান কেন্দ্র রূপে গড়ে তোলার সঙ্কল্প নেওয়া হয়। প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ও বিশ্ববোধের অন্তর্নিহিত ঐক্যকে উদ্ধার করে এক প্রাচ্য বা দেশজ সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থানের ভিত্তিতে বিশ্বের জ্ঞানচর্চাকে এখানে আহ্বান জানানো তার একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।[12] অথচ এই যুগ থেকেই কলাভবনে

[10] ‘সেকালে আমাদের আশ্রমের ছাত্রদের মডার্ন-আর্টের ওপর অহেতুক ভক্তি জন্মে গেল স্টেলা ক্রামরিশের কৃপায়। ... আমার বোধ হয়, বিদেশী বলেই যেন ওঁদের ভক্তির মাত্রা একটু বেড়ে গেল। ... আমি ঠিক সবটা বুঝতেও পারতুম না। অথচ আশ্চর্য এই, আমার ছাত্র হয়ে ওঁরা সব ঠিক ঠিক বুঝে গেলেন। এবং ক্রমশঃ ঐ মডার্ন আর্টের ফ্যাশানে ছবি আঁকতে আরম্ভ করে দিলেন। ... - স্টেলার এই অভাবিত গুণপনা দেখে অবনীবাবু তাঁর নাম দিয়েছিলেন - ‘দিদিমণি’।’ পঞ্চানন মণ্ডল, *ভারতশিল্পী নন্দলাল,* ২য় খণ্ড, রাঢ় গবেষণা পর্ষদ, শান্তিনিকেতন, ১৩৯০ [১৯৮৩]। পৃ. ১২২ এবং ‘তিনি [স্টেলা ক্রামরিশ] দেখতেন জার্মান শিল্প অধ্যাপকের দৃষ্টিভঙ্গীতে সব কিছু। ... মোটকথা তিনি আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীদের উপদেষ্টা হয়ে ভুল পথও কখন কখন দেখিয়েছেন আর্টে এবং সেইজন্য তারফল আজও ভালো হয়নি আর্ট শিক্ষার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফৎ।’ অসিত কুমার হালদার, *রবিতীর্থে,* পাইওনিয়র বুক কোং, কলকাতা, মাঘ ১৩৬৫ (১৯৫৯)। পৃ. ৭৯-৮০ দ্রষ্টব্য।

[11] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বিশ্বভারতী,* ৩-সংখ্যক রচনা ও পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। *রবীন্দ্ররচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, বিশ্বভারতী (সুলভ সংস্করণ)

[12] ‘To bring into more intimate relation with one another, … the different cultures of the East on the basis of their underlying unity. To approach the West from the standpoint of such a unity of

শিল্পকলা চর্চার একটি ঝোঁক দেখা গেল এই আধুনিক-পশ্চিমী অর্থে শিল্পী হয়ে ওঠার ; স্টেলা-প্রচলিত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে শুরু হল শিল্পকলার বিশ্লেষণ। দেশজ দৃশ্যশিল্প বিদেশির চোখে দেখার অসভ্য অভ্যাসের যে শিক্ষিত বিকল্প তৈরির সচেতন প্রয়াস লক্ষ করা যায় বিশ্বভারতীর প্রথম যুগের কর্মকাণ্ডে, সেই দেশজ ভিত্তি থেকে বিশ্বকে ছোঁওয়ার-দেখার চর্চা বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হয় এই যুগ থেকেই। বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও ওই দৃষ্টিভঙ্গী একটি ঝোঁক হিসেবেই টিকে ছিল কলাভবনে ; সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা এবং তার ফল স্বরূপ আঙ্গিক ও অবয়ব সর্বস্ব দৃশ্যরূপ নির্মাণ তখনও গ্রাস করতে পারেনি কলাভবন সমাজকে। 'প্রধানত চিত্রপ্রদর্শনী'-র বাইরে যৌথ উদ্যোগে ছাত্রছাত্রী-মাস্টারমশাইদের সৃজনক্রিয়ায় গড়ে উঠেছিল অন্য এক ভারতবোধ - প্রাচ্য বা এশিয়চৈতন্য।

প্রাচ্য বা এশিয় - এই ধারণাটি শুনতে নিরীহ হলেও, প্রাচ্যবিদ্যার ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তার জটিলতা ও গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধে সংশয় জেগে ওঠায় আজ আর ততটা নিরীহ নেই। ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হয় জাপানী মনীষী কাকুজো ওকাকুরার *The Ideals of the East,* যার প্রথম বাক্যটি প্রায় রাজনৈতিক স্লোগানের ভঙ্গীতে ঘোষণা করে, Asia is one.[13] পশ্চিমী প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে ওকাকুরা নিয়েছিলেন এই কৌশল। প্রাচ্যের স্বরূপ উদঘাটনে তাই প্রতীচীকে এক বিরোধী অবস্থানে প্রতিষ্ঠা করাও হয়ে ওঠে এই কৌশলের অঙ্গ। এই এশিয়চৈতন্য আবিষ্কারের প্রক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ হয় ওকাকুরার। আমরা

---

life and thought of Asia.' VISVA BHARATI / MEMORANDUM OF ASSOCIATION / STATUTES AND REGULATIONS, 1922.

[13] 'The Himalayas divide, only to accentuate, two mighty civilisations, the Chinese with its communism of Confucious, and the Indian with its individualism of the Vedas. But not even the snowy barriers can interrupt for one moment that broad expanse of love for the Ultimate and Universal, which is the common thought-inheritance of every Asiatic race, enabling them to produce all the great religions of the world, and distinguishing them from those maritime peoples of the Mediterranian and the Baltic, who love to dwell on the particular, and to search out the means, not the end, of life.' Kakuzo Okakura, *The Ideals of the East,* E. P. Dutton and Company, New York, 1920. p. 1

জানি যে পূর্ব, প্রাচ্য বা এশিয় ধারণাটি নিয়ে ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত এডওয়ার্ড সঈদের *Orientalism* গ্রন্থটি তার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের গভীরতায় খুলে দিয়েছে প্রাচ্যবিদ্যা-চর্চার এক বিস্তৃত দিগন্ত। প্রাচ্যবিদ্যা-চর্চার বিস্তারিত আলোচনায় সঈদ দেখান যে এটি আসলে পশ্চাত্য-উদ্ভাবিত একটি ধারণা - অন্যান্য সমাজ-সংস্কৃতি থেকে নিজেদের বিশিষ্ট করতে এবং এই 'অন্য'-দের ওপর আধিপত্য বিস্তারের দাবিতেই প্রয়োজন হয়েছিল এই ধারণাটির।[14] এই প্রেক্ষিতে বিশ্বভারতী-কলাভবনের আদর্শে এশিয়চৈতন্যর ধারণাটি ঠিক কেমন ছিল বোঝার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বিশ্বভারতীর আদর্শে এই এশিয় ঐক্যের ধারণাটি অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের বোঝাপড়ার ওপর নির্ভরশীল ছিল, আর সেটি ছিল এমনকী ওকাকুরার বোঝাপড়ার থেকেও ভিন্ন।[15] প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে একে অপরের থেকে পৃথকীকরণের উদ্দেশ্যে রচিত হয় এশিয়া সম্পর্কে নানান ধারণা। এশিয়াবাসীরা অন্যদের কাছে 'তোমরা এশিয়ান' আর নিজেদের কাছে 'আমরা এশিয়ান' হিসেবে ভেঙে যান।[16] ঐক্য ও সামঞ্জস্যে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ এশিয় ঐক্যের সন্ধান করার প্রয়োজন অনুভব করেন, নিজ নিজ স্বরূপ বজায় রেখে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এক সভ্য মিলনের লক্ষ্যে, একে অপরের বিরোধী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে নয়।[17] এশিয় ঐক্যই সম্ভব করতে পারে এই মিলন ; বিশ্বভারতীর

[14] Edward W. Said, *Orientalism: Western Conceptions of the Orient,* Routledge and Kegan Paul Ltd. 1978 দ্রষ্টব্য।

[15] Rustom Bharucha, *Another Asia: Rabindranath Tagore and Okakura Tenshin,* Oxford, New Delhi, 2006 দ্রষ্টব্য।

[16] Naoki Sakai, ' "You Asians'': On the Historical Role of the West and Asia Binary' The South Atlantic Quarterly 99:4, Fall 2000. Duke University Press. p. 789. দ্রষ্টব্য।

[17] রবীন্দ্রনাথের মতে, 'you all know what a great force it is in Europe that these Western peoples have such a thing as continental concerts of mind. …All the several countries of that continent contribute to a common coffer their individual wealth of mind, and intellectual treasure has been accumulating for centuries in the West. …It proved that when human minds with their respective capacities work together, a very great potent power is generated that has in it immortal life; and this is the highest lesson which we can accept from European civilization. …Our cultures are too scattered. They yet have not any possibility of interconnection, and owing to that, they have their provincialism, something which is peculiar to each people with their idiosyncracy and mannerism that generally has the character of stammering in them.' আবার সেই একই বক্তৃতায় স্মরণ

ধারণাটি এই মিলনের আদর্শের ওপরই প্রতিষ্ঠিত।

'তোরা আসলে কলাভবনের ইতিহাস লেখার ইতিহাসচর্চা করতে চাস না। দ্বারিক সর্দার আর দেবেন্দ্রনাথের কথা কি আবার করে ফিরে এল না এই দ্বারিক বাড়িতে জন্মানো এক প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ? রামকিঙ্কর-বিনোদবিহারীকে মহিমান্বিত করতে গিয়ে ধামাচাপা পড়া এই অন্য কলাভবনের শতবর্ষ উদযাপনের কি কোনও তাৎপর্য নেই ?' ছেলেটির কথা শেষ হতে না হতেই মেয়েটির চাঁছাছোলা উত্তর, 'ওরে, পাবলিক পারসেপ্‌শন বলে একটা কথা আছে তো, নাকি ? যে তিনজন শিল্পী এই কলাভবন গড়ে তুললেন সেই অসিতকুমার, সুরেন্দ্রনাথ, নন্দলাল সবাইকে তো আমরাই আমাদের কলেজে তৈরি করে পাঠালাম। আর বাকি যাদের নিয়ে তোরা গর্ব করে থাকিস, তারাও তো তাই-ই - সোমনাথ হোড়-সর্ব্বরী রায়চৌধুরী, তারপর অজিত চক্রবর্তী-সনৎ কর, সুহাস রায়-লালুপ্রসাদ সাউ ... কোথা থেকে পেলি এঁদের ? আর ৮০-র দশকে কলাভবনে অধ্যাপক পদে যোগ দেওয়া যোগেন চৌধুরীও তো এখানেই তৈরি !!! এঁরা কেউই কিন্তু এমনি এমনি কলাভবনে চলে আসেন নি। আমাদের কলেজে শিক্ষা শেষ করে শিল্পী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে ; সেই যোগ্যতায় গ্রহণ করেছেন এখানের শিক্ষকতার দায়িত্ব। তাহলে যাঁদের কল্যাণে তোরা এই কলেজের আয়ু শতবর্ষ অবধি টানতে পারলি, তাঁদের কথা ভাবলে শতবর্ষের অনুষ্ঠানটা কি আমাদের কলেজেই হওয়া উচিত ছিল না ?'

করিয়ে দিতে ভোলেন না যে, 'haven't I seen in the West manifestations of the national pride which gloats in the humiliation of its neighbours and fellow-beings without knowing that such humiliation comes back to itself? …The generosity in human relationship I claim as something special to the East. We do acknowledge our human responsibilities to our neighbours, to our dependents, to all those who are related to us and this personal element in our civilization is something which we cannot afford to lose.' Rabindranath Tagore, 'On Oriental Culture and Japan's Mission', [Tokyo, 15 May 1929] Sisir Kumar Das [Ed.] *The English Writings of Rabindranath Tagore,* Vol. III, Sahitya Akademi, New Delhi, 1996. pp. 606-607, 608.

কলাভবনের 'পুনরুজ্জীবন'

১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হ'ল, ভারতীয় সংবিধান লিখিত ও গৃহীত হল ১৯৫০ আর প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল ১৯৫১-৫২ সালে। ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পেল এবং চলে এল সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে। এই বছরই নন্দলাল অবসর গ্রহণ করলেন। এর পর এই কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলাভবন পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন যথাক্রমে সুরেন্দ্রনাথ, ধীরেনকৃষ্ণ, বিশ্বরূপ বসু, ভি. আর. চিত্রা। ১৯৬৬ সালে নন্দলালের মৃত্যুর পর কিছুদিনের জন্য কলাভবন পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়।[18] একদিকে বিশ্বভারতীর আদর্শ, নন্দলালের শিক্ষাদর্শ আর অন্য দিকে সরকারি শিক্ষানীতি ও আইনের মাঝখানে পড়ে একাধিক বিরুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীর সহাবস্থানে কলাভবনে দেখা দিল চূড়ান্ত এক আদর্শগত বিভ্রান্তি। শুরু হল ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তন করার আলোচনা, শিক্ষাক্রমে বিষয় হিসেবে স্থান পেল শিল্প-ইতিহাস, পরীক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন ইত্যাদি। দিশাহীন, নিষ্প্রাণ, দ্বিধাবিভক্ত এই কলাভবনে ১৯৬৭ সালে বিনোদবিহারীর ইচ্ছায়[19] কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র দিনকর কৌশিক নিযুক্ত হন কলাভবনের স্থায়ী অধ্যক্ষ হিসেবে।

কলাভবনের সামনে ভবিষ্যতের জন্য খোলা ছিল দুটি পথ : হয় তাকে বিশ্বভারতী-কলাভবনের আদর্শগত বাহ্যিক রূপ গলায় অলঙ্কাররূপে পরে মৃত্যুর পথে ক্ষইতে থাকতে হত নয় স্বাধীন ভারতের নতুন শিক্ষানীতি

---

[18] কলাভবনের সেকাল ও একাল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পাওয়া যাবে, *Nandan,* Kala-Bhavana – Then and Now: A Special Issue. Department of History of Art, Kala Bhavana, Santiniketan. 1978-79 পত্রিকায়।

[19] 'In 1966, after Nandalals' [*sic*] passing away, Benodeda took over, till Dinkar Kowshik joined in 1967 as the principal, at Benodadas'[*sic*] instance.' Dinkar Kowshik, 'Kala Bhavan', Exhibition Catalogue, *Art in Art Colleges of West Bengal,* Birla Academy of Art and Culture, Kolkata. 05-23 December 2001. p.38

গ্রহণ করে চাকরি ও বাজারকেন্দ্রিক এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হতে হত। কলাভবনের এই টালমাটাল অবস্থায় বিনোদবিহারী প্রদর্শিত নীতি অনুসরণ করে দিনকর কৌশিক বেছে নিলেন দ্বিতীয় পথটিকে। শুরু হ'ল তাঁর নেতৃত্বে কলাভবনের ভাঙা-গড়া ; ঢেলে সাজানো হল কলাভবনের শিক্ষা-কাঠামোকে। নন্দলাল মারা গেলেন ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে, ১৯৬৭ সালে নন্দলাল-মুক্ত কলাভবনে আর পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছকে চিরাচরিত আর্ট কলেজের আদর্শে প্রচলিত হ'ল ডিগ্রি কোর্স, স্পেশালাইজেশন, নির্বোধ পরীক্ষা পদ্ধতি ! অসামান্য প্রশাসনিক দক্ষতায় দিনকর কৌশিক কলাভবনকে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হলেন একটি উৎকৃষ্ট আর্ট কলেজে। কলাভবনে জাতীয় শিক্ষানীতির প্রয়োগ ও 'প্রধানত চিত্রপ্রদর্শনী'-কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম প্রবর্তন কলাভবনের পরিবেশে নিয়ে এল এক ধরনের স্থিরতা ও সজীবতা। প্রধানত দিনকর কৌশিকের কলাভবনে নিযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্প-লেখকরা তাই এই পর্বকে প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও চিহ্নিত করলেন কলাভবনের 'পুনরুজ্জীবন', 'নবজীবন' হিসেবে। আর্ট কলেজের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিষ্ঠিত কিছু পেশাদার শিল্পীকে নিয়োগ করা প্রয়োজন ; প্রয়োজন এমন এক বিদ্যার বিতরণ যা খ্যাতি ও অফুরন্ত অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখায়। এ-ছাড়া, সরকার অনুমোদিত সার্টিফিকেট, চাকরির ক্ষেত্রে একটা বড় হাতিয়ার - নইলে ছাত্রছাত্রী আসবে কেন ?

'ওই যে-ক'জন প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের কথা বললি, তাঁদের আগমন কৌশিকের এই পুনরুজ্জীবিত কলাভবনে। প্রদর্শনীকক্ষের দেওয়াল-উপযুক্ত চারচৌকো ছবি আর মেঝে-উপযুক্ত স্টুডিও-উৎপাদিত মূর্তি গড়ার বাইরে অন্যান্য সামাজিক-প্রাকৃতিক পরিসরে তাঁদের সৃজনীশক্তি ছিল অকেজো ও অপ্রাসঙ্গিক। শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী সমাজের উৎসব-অনুষ্ঠান, বৈতালিক, বার্ষিক ভ্রমণ পরিচালনা, আলপনা, মণ্ডনশিল্প, সাপ্তাহিক মন্দির, ছাত্র আন্দোলন, শিক্ষক সংগঠন, ক্রীড়া-উৎসব, নাট্য-উৎসব, রূপ-অঙ্গ-

মঞ্চসজ্জা, গ্রামসেবা - কোথাওই এঁদের কার্যকর অংশগ্রহণের কোনও যোগ্যতা ছিল না, এইসব পরিসরে তাঁদের অনুপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মত।' মেয়েটি এইবার যেন একটু শান্ত হয়ে বুঝতে চেষ্টা করে এই সমান্তরাল দৃষ্টিভঙ্গীর তাৎপর্য। গভীর মনোযোগে শুনতে থাকে তার বন্ধুর বলে চলা এই অন্য আখ্যান।

পুনরুজ্জীবিত কলাভবনে স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের কোনও ভূমিকা রইল না, অথচ প্রকাশ্যে তাঁদের অস্বীকারও করা যায় না। আর, এরকম সময় যা ঘটে থাকে এখানেও তাই লক্ষ করা গেল - বন্দনা করার নামে নন্দলালকে ছবি করে দেওয়া হল। নবনন্দন, যাকে এই কলাভবনের প্রতীক হিসেবেও দেখা যায়, তার প্রধান দরজার ওপর প্রতিষ্ঠিত হ'ল নন্দলালের বিশাল এক প্রতিকৃতি - এখনও সেই 'ছবি করে দেওয়া নন্দলাল' পূজিত হন নন্দনমেলার সময় মাস্টারমশাইয়ের স্টুডিওর বারান্দায়।

'মুছে ফেলার প্রক্রিয়ায় দৃশ্যরূপের এক বড় ভূমিকা আছে, বুঝলি', হাসি মুখে বলে চলে ছেলেটি, 'এই ঘটনার কয়েক বছর আগে দেখা গেল সিংহসদনের পশ্চিমদিকে একটি ঘড়িমিনার তৈরি হল যার উচ্চতা পূর্বদিকের ঘণ্টামিনারের চেয়ে বেশি - নষ্ট হ'ল এতদিন ধরে গড়ে ওঠা দৃশ্য-ভারসাম্যের নান্দনিক রুচি। সে যা হ'ল হ'ল, কিন্তু মজাটা হ'ল সেই মিনারের চারদিকে স্থান পেল ছোটো ছোটো চারটি সিংহের মূর্তি ! রায়পুর সিংহ পরিবারের লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের অর্থানুকুল্যে নির্মিত হয়েছিল এই সিংহসদন, তাই এই নামকরণ। মনুষ্য পদবীকে পশু সিংহে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে রায়পুর জমিদার পরিবারের আন্তরিক সম্পর্ক ও শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠায় রায়পুর জমিদার বাড়ির

অবদান, দুটিকেই কেমন অনায়াসে মুছে ফেলা গেল !'[20] 'কলাভবনের কথায় ফিরে আয় প্লিজ্, আমি এই আখ্যানটা শুনতে চাই।' মেয়েটি অধৈর্য হয়ে ওঠে।

নন্দলালকে না হয় সরিয়ে ফেলা গেল কিন্তু কাদের সামনে রেখে তাহলে এগোবে এই কলাভবন ? **১৯২২-২৩** সাল নাগাদ কলাভবনে পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গীর যে ঝোঁক লক্ষ করা যায় তা এতদিনে তার পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা নিয়ে বিকশিত। আধুনিকতাবাদের অপ্রতিরোধ্য ঠেলায় অন্যান্যদের সরিয়ে দুটি নামকে বেছে নিতে তাই অসুবিধা হল না মোটেই। এ-ছাড়া স্বাধীন ভারত সরকার পরিচালিত আকাদেমি, হস্তশিল্প-খাদি নিগম, শিল্পপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদির দায়িত্বে নিযুক্ত হন আর্ট কলেজ থেকে পাস করা কিছু শিল্প-প্রশাসক। তাঁরাই শিল্পসংস্কৃতির সরকারি নীতিনির্ধারণ করার কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। আধুনিকতার আদর্শ অনুযায়ী কলাভবন থেকে তাঁরা বেছে নেন বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্করকে। চলতে থাকে তাঁদের সরকারি প্রচার ; সরকারি অর্থে প্রকাশ পেতে থাকে এঁদের কাজ নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা, বই, এঁদের কাজের রিপ্রোডাকশন ইত্যাদি। বিশিষ্ট এই দুই শিল্পীকে বৃহত্তর শিল্পীসমাজে প্রতিষ্ঠিত করার এই প্রয়াস সমৃদ্ধ করে ভারতবর্ষের শিল্প-সংস্কৃতি জগৎকে। তারই পাশাপাশি একই শক্তি নিয়ে চলতে থাকে কলাভবনের অন্য সকল, বিশেষ করে মহিলা শিল্পী ও যৌথ শিল্পোদ্যোগকে ইতিহাস থেকে সমূলে মুছে ফেলার নিঃশব্দ এক প্রক্রিয়া। সচেতন প্রয়াসে গণস্মৃতি ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম থেকে মুছে ফেলা হয় কলাভবনের সমস্ত যৌথ উদ্যোগের ইতিহাস - খুব বড় রকম ক্ষতি হয় নতুন ভারতবর্ষের শিল্প-সংস্কৃতি জগতের।

তবে এ-কথাও একই সঙ্গে মনে রাখা জরুরি যে বেছে নেওয়া এই

---

[20] রায়পুর সিংহ ও জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের সম্পর্ক সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, বুদ্ধদেব আচার্য, 'রূপান্তরে শান্তিনিকেতন', তপনকুমার সোম (সম্পাঃ), *রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন,* দীপ প্রকাশন, কলকাতা। ২০১০। পৃ. ১৫-৬২

দু'জন শিল্পীই কলাভবনের শ্রেষ্ঠ অবদান বলে মেনে নেন নি সকলে। ১৯১০ সালে ছয় মাস বয়স থেকে শান্তিদেব ঘোষ শান্তিনিকেতনের আশ্রমজীবন যাপন করেছেন, তাঁর সঙ্গে প্রথম যুগের কলাভবনের ঘনিষ্ঠতাও সর্বজনবিদিত। তাঁর স্মৃতিকথায় তিনি উল্লেখ করতে ভোলেন না যে, '... বিনোদবিহারী, রামকিঙ্কর - ওরা খুব নাম করেছে, কিন্তু ওরা একটা জায়গায় বদ্ধ হয়ে ছিলেন। নিজেদের একটা দিকে। ওরা সামগ্রিকভাবে বিশ্বভারতীর নানা দিকে যে শিল্পসৃষ্টির চেষ্টা গুরুদেব ক'রে গেছেন, সে-দিকটা নিয়ে মাথাই ঘামায় নি। একমাত্র রামকিঙ্কর ওর শখ ছিল নাটক করা মাঝে মাঝে নাটক করার চেষ্টা করত, ... কিন্তু বিশ্বভারতীর সর্বাঙ্গীন লাইফটা ডেকরেট করার দিকে, চিত্রবিচিত্র করার দিকে ওরা কোনো চেষ্টা করেনি - বিনোদবিহারী তো একেবারেই করেনি।'[21]

'তুই ওই "কেবলমাত্র দুটি পাতে দেওয়ার মত শিল্পী"-র কথা তুললি বলে এত ঘটনাপরম্পরার উল্লেখ করতে হ'ল।' বোঝা যায় ওই কথাটা ছেলেটির আঁতে লেগেছিল আর এতক্ষণ পর তার একটা উপযুক্ত জবাব দিতে পেরে তাকে বেশ তৃপ্ত দেখায়। 'সরি সরি, খেপে যাস না - শেষ কর তোর কলাভবনের গপ্পো।'

বিশ্ববোধের সামগ্রিকতাকে ধারণ করতে পারত যে-ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জগৎ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল যুগে তার বিলুপ্তিতে সেই স্থান অধিকার করল তিনটি সম্পর্কিত অথচ স্বাধীন জ্ঞানচর্চার জগৎ - বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র ও নন্দনতত্ত্ব। এরাও ধীরে ধীরে হয়ে উঠল স্বশাসিত - নন্দনতত্ত্ব অন্যান্য জ্ঞানের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে হয়ে উঠল নন্দনতাত্ত্বিকদের স্বাধীন রাজ্য। কেবলমাত্র শিল্পকলার জগতে বিচরণ করা নতুন কলাভবনের সমাজ তাই আধুনিকতার শর্ত অনুযায়ী বিচ্ছিন্ন হতে থাকল শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর অন্যান্য কর্মকাণ্ড থেকে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক, উপকরণ-সর্বস্ব

[21] শান্তিদেব ঘোষ, *স্মৃতি ও সঞ্চয়*, দে'জ, কলকাতা, ২০১৩। পৃ. ২২

দৃশ্যরূপ 'উৎপাদন' কলাভবনকে সরিয়ে নিল সমাজ ও প্রকৃতি-লগ্ন শিল্প'চর্চা'-র জগৎ থেকে।[22]

নন্দলালের অবসর গ্রহণের পর শান্তিনিকেতন সমাজ থেকে কলাভবনের বিচ্ছিন্ন হবার প্রক্রিয়াটি গতি পায়। কলাভবন সমাজের এক অংশের উত্তরোত্তর আধুনিক হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা আধুনিক শব্দের *পরে* আর একটি শব্দ বসিয়ে অদ্ভূত কিছু শব্দবন্ধ তৈরি করে। বিশ্বসংস্কৃতির বাজারে মান্যতা পাবার আশায় তৈরি এই শব্দবন্ধগুলি আজও সচল ও আকর্ষক : আধুনিক ছাত্রাবাস, আধুনিক বাথরুম, আধুনিক কবিতা, আধুনিক শিক্ষা, আধুনিক আর্ট, আধুনিক আর্টকলেজ ...। এই প্রক্রিয়ায় পুনরুজ্জীবনের এক ভ্রান্ত বোধ উৎপন্ন হয় ঠিকই কিন্তু তা ভেঙে পড়তে সময় লাগে না বেশি। ভ্রম কেটে মুখোমুখি হতে হয় বাস্তবের : আধুনিকতা-উৎপাদনকারী বিশ্বের বাজারে এরা পড়ে থাকে আধুনিকতা-ভোগী ব্রাত্য হসেবেই। এমন এক সময় আবার মান্যতা পাবার আশায় কোমর বেঁধে নির্মাণকার্য শুরু হ'ল উল্টো পথে। আধুনিক শব্দের *আগে* বসানো শুরু হল আরেকটি শব্দ : আমাদের-ওদের আধুনিকতা, জাতীয়-আঞ্চলিক আধুনিকতা, এথিকাল-আনেথিকাল আধুনিকতা, ঘটি-বাঙাল আধুনিকতা, বঙ্-মাল্লু আধুনিকতা, কন্টেকস্টচুয়াল-ননকন্টেকস্টচুয়াল আধুনিকতা ... আরো কত শ্রুতিসুখকর অথচ নির্বোধ 'সোনার পাথরবাটি'-মার্কা ধারণা আর শব্দবন্ধ।

কাজ যে এতেও কিছু হয় নি, এ-কথা বোঝবার সময় বোধ হয় এখনও আসেনি। তবে এই সব ক'টি পর্বেই কলাভবন ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হয়েছে শান্তিনিকেতন ও বৃহত্তর সমাজ থেকে, কলাভবন হয়েছে আর্ট কলেজ।

---

[22] 'The earlier Nandalal way of learning through festivals, excursions and project work on site continues in fits and starts.' Dinkar Kowshik, 'Kala Bhavan', Exhibition Catalogue, *Art in Art Colleges of West Bengal,* Birla Academy of Art and Culture, Kolkata. 05-23 December 2001. p.38

রবীন্দ্রোত্তর কলাভবন : নন্দলাল-বিনোদবিহারী দ্বন্দ্ব

বৃহত্তর সমাজ থেকে কলাভবনের বিচ্ছিন্ন হওয়া আর আধুনিক হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় দিনকর কৌশিকের ভূমিকা অনস্বীকার্য তবে এই যুগে যে মানসিকতা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'ল তারও একটা পূর্ব ইতিহাস আছে।

ট্রেনের এক বয়স্কা সহযাত্রী কিছুটা কুণ্ঠিত হয়েই এই মুহূর্তে যোগ দিলেন কথোপকথনে, 'বছর পনেরো আগের ঘটনা, মেয়েকে কলাভবনে ভর্তি করার ইচ্ছা নিয়ে বাবা-মা ও মেয়ে এসেছেন কলাভবনে। সকালের কলাভবনে তখনও ছাত্রছাত্রীদের ভিড় জমে ওঠেনি ; জনা তিনেক শিল্পইতিহাসের শিক্ষক ক্যান্টিনের বাইরে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিলেন। তাঁদের পেয়ে বাবা-মা কলাভবনের পাঠ্যক্রম, হস্টেলের ব্যবস্থা, খরচা, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। এঁদের মধ্যে একজন মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে প্রশ্নগুলি শুনছিলেন, প্রশ্নাবলির মাঝখানে তিনি মাথাটা নিচু রেখেই পাশ ফিরে তাঁদের দিকে তাকিয়ে নির্লিপ্ত কণ্ঠে হঠাৎ উল্টো প্রশ্ন করলেন "বাঙলা মিডিয়াম না ইংলিস্ মিডিয়াম ?" বাকিরা হাসতেও পারছেন না, অন্য কিছু বলেও উঠতে পারছেন না আর মেয়েটির বাবা-মা ছবি আঁকা শিক্ষারও যে বাঙলা-ইংলিস্ মিডিয়াম আছে এই নতুন তথ্যটি পেয়ে একেবারে থমতত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, ... আমিও আসলে ওই শতবর্ষের অনুষ্ঠান উপলক্ষেই চলেছি শান্তিনিকেতন, তোমাদের কথার মাঝখানে এই গপ্পোটা বলার লোভ সামলাতে পারলাম না।' ট্রেনের সকলেই কৌতুকময় এই পরিবেশে আরো চাঙ্গা হয়ে উঠলেন।

কলাভবনের বিবর্তনের ইতিহাস আসলে এই বাঙলা থেকে ইংলিস্ মিডিয়ামে রূপান্তরের ইতিহাস। এই সূত্রেই নন্দলাল-বিনোদবিহারী শিক্ষাদর্শের বিরোধ ও দ্বন্দ্বের স্বরূপ বিশেষ মনোযোগে অধ্যয়ন করা জরুরি। বিনোদবিহারী জানিয়েছেন, 'বেশ কিছুদিন নন্দলাল আমাকে সুনজরে দেখেন নি। তাঁর মনে হয়েছিল, গুরুদেব জোর করে এমন

একজনকে তাঁর ঘাড়ে চাপালেন যে শিল্পজগতে প্রবেশের অনধিকারী। যার চোখ নেই, সে ছবি আঁকবে কি করে ? ... নন্দলাল আমাকে মাদুর, ডেস্ক, জলের পাত্র ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত করেন নি, কিন্তু আশেপাশের সবাইকে তিনি দেখাতেন, কেবল আমাকে ছাড়া।' (পৃ. ২৪, ২৫) 'নন্দলাল সম্পূর্ণ স্বাধীন থেকেও কলাভবনকে রক্ষনশীলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে চললেন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে।' (পৃ. ৪৬) আর সেই কারণেই 'সে সময়ে কলাভবনের পরিবেশ আমার [বিনোদবিহারীর] কাছে কিছু পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল।' (পৃ. ৪৮) এই পীড়া থেকে মুক্তি পেতে হিন্দিভবনে বড় মিউরাল করার পরিকল্পনা করলেন, 'হিন্দি-ভবনের অধ্যক্ষ হাজারিপ্রসাদের অনুমতি পেতে অসুবিধে হল না, অসুবিধে হল নন্দলালের কাছে অনুমতি পেতে। ... জীবনে এই প্রথম তিনি [নন্দলাল] আমার [বিনোদবিহারীর] কাজে বাধা দিলেন, আমিও [বিনোদবিহারীও] প্রথম তাঁর কথা উপেক্ষা' (পৃ. ৪৮) করলেন। সম্ভবত এই সব কারণেই বিনোদবিহারী খোলা মনে নন্দলালকে গুরু বলে মেনে নিতে কুণ্ঠা বোধ করেছেন : 'তাই ভাবি আমি শিখলাম কার কাছ থেকে ? নন্দলালের কাছ থেকে, না লাইব্রেরি থেকে, অথবা শান্তিনিকেতনের এই রুক্ষ প্রকৃতি থেকে ? নন্দলাল না থাকলে আমার আঙ্গিকের শিক্ষা হতো না, লাইব্রেরি না থাকলে আমার জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব হতো না, আর প্রকৃতির রুক্ষ মূর্তি উপলব্ধি না করলে আমার ছবি আঁকা হতো না।' (পৃ. ৪৬) জ্ঞান আহরণ ও প্রকৃতির রুক্ষ মূর্তি উপলব্ধি করার সম্ভাবনা পৃথিবীর সর্বত্রই আছে আর আঙ্গিকের শিক্ষা সম্পূর্ণ হবার পর নন্দলালের প্রয়োজন তাঁর ইতিমধ্যেই ফুরিয়েছে, কাজেই রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর সাত বছর মানসিক পীড়া ও দ্বন্দ্বে ভুগে বিনোদবিহারী প্রায় গোপনে নেপাল সরকারের এক প্রশাসনিক চাকরিতে যোগ দিতে 'এক সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনের মায়া কাটিয়ে নেপাল রওনা'[23] (পৃ. ৫২) হলেন।[24]

---

[23] বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, *চিত্রকর,* অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৯

নন্দলালের মৃত্যুর পর, পরিণত বয়সে তাঁর আত্মকথায় বিনোদবিহারী নন্দলাল সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট করলেন এই লিখিত বয়ানে কিন্তু যা স্মৃতি ও ব্যক্তিগত মতামত নয় তা তিনি লিপিবদ্ধ করলেন এরও বছর পাঁচেক আগে লিখিত *আধুনিক শিল্পশিক্ষা*-র বিশ্লেষণে। কলাভবন ও নন্দলাল সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য এই গবেষণা গ্রন্থে ব্যক্তিগত অভিযোগ-অভিমান-মুক্ত নিরাসক্ত রূপ নেবে এইটিই প্রত্যাশিত। বিনোদবিহারীর মতে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে 'নন্দলালের অবসর-গ্রহণের সময় পর্যন্ত কলাভবনের শিক্ষা-নীতি যে দিকে চালিত হয়েছিল সেটির প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতীয় অলঙ্করণ-শিল্পের অনুশীলন।' 'প্রবীণ শিক্ষকদের প্রভাব ও অলঙ্করণ-শিল্পের চর্চার মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব' দেখা দেওয়ায় নন্দলাল 'ব্যক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে ... প্রতিষ্ঠানের উপযোগী করে কলাভবনের শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন।' (পৃ. ৯৮) বিনোদবিহারীর এই পর্যবেক্ষণ কতটা সত্যনিষ্ঠ সে বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই কিন্তু কলাভবনের শিক্ষানীতি বিবর্তনের ক্ষেত্রে ওই দ্বন্দ্বের স্বরূপটি উদ্ধার করা জরুরি ; শিল্পশিক্ষা ব্যক্তিনির্ভর হবে, না প্রতিষ্ঠানের আদর্শ-নির্ভর হবে, দ্বন্দ্ব তো এখানেই। বিশ্বভারতীর মূল প্রকল্পে এই দ্বন্দ্বের কোনও স্থান ছিল না কারণ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেখার অভ্যাস তাঁরা বর্জন করেছিলেন - এদের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠাই ছিল এই আশ্রমের উদ্দেশ্য। ১৯৪০-এর দশকের কলাভবনের ইতিহাস এই দ্বন্দ্বের ইতিহাস। কলাভবনের প্রবীণ শিক্ষক বিনোদবিহারী লক্ষ করেছেন যে 'ক্রমেই তাঁর [নন্দলালের] রক্ষণশীল মনোভাব আত্মপ্রকাশ করে। ... যে কোনো কারণেই হোক নন্দলাল নব্যকালের রুচি,

[24] 'We had heard that he [Binodbihari] was leaving Santiniketan and I asked him about it. He did not say anything. The next day he handed me a piece of paper and said, "Send this telegram for me. This also answers the question you asked me yesterday. You are not to talk about it." This was the telegram accepting the curatorship of Kathmandu Museum.' Riten Mozumdar, 'Binode Da', *Visva-Bharati News*, March-April, 1981. p. 318

মেজাজ, আচার-ব্যবহার সকল বিষয়েই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন।' (পৃ. ১০২) এই দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ দেখা যায় যে 'নন্দলালের যে-সব সহকর্মী এ পর্যন্ত তাঁকে বিনা তর্কে অনুসরণ করেছিলেন তাঁদের দু-এক জন নন্দলালের এই নূতন পরিকল্পনা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ' (পৃ. ১০১)[25] করলেন।

এই 'দু-এক' জনের একজন যে বিনোদবিহারী তা বুঝতে অসুবিধা হয় না, অন্যজন নিশ্চয়ই রামকিঙ্কর যদিও তাঁর কোনও লেখায় তিনি এমন নির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত মতামত ও অভিযোগ প্রকাশ করেন নি। ৪০-এর দশকের এই দ্বন্দ্বের সময় বিনোদবিহারী-রামকিঙ্করকে ঘিরে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গড়ে ওঠে ছোটো একটি গোষ্ঠী। প্রধানত ইংরিজি শিক্ষিত ও ইংরিজিতে কথা বলা, শহুরে মানসিকতার এই গোষ্ঠীর মননে ও পরবর্তীকালে, আধুনিক হয়ে খ্যাতি লাভের আকাঙ্ক্ষায় বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীদের স্বভাবে আশ্রয় পায় বিনোদবিহারীর মতামত : রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর নন্দলাল রক্ষণশীল হয়ে উঠেছিলেন ও ভারতীয় অলঙ্করণ-শিল্পকেই পাঠ্যক্রমে বাধ্যতামূলক করে কলাভবনকে পশ্চাদগামী করে তুলেছিলেন। এই গোষ্ঠীর বিশ্লেষণে পশ্চাদগামী নন্দলাল তাই হয়ে উঠলেন অচল, অপ্রাসঙ্গিক। সর্বস্তরের ছাত্রছাত্রীদের কাছে ৪০-এর দশকের এই ছাত্রছাত্রী-দলের গড়ে তোলা কলাভবনের ইতিহাসের রূপরেখা স্বীকৃতি পেল। অসিতকুমার, সুরেন্দ্রনাথ ও বিনায়ক মাসোজির অবদানকে সম্পূর্ণ ঝরিয়ে দিয়ে তুলে ধরা হ'ল কলাভবনের প্রথম ত্রয়ীকে : নন্দলাল-বিনোদবিহারী-রামকিঙ্কর। স্তব্ধ হল এই ত্রয়ী ছাড়া আর সমস্ত বিষয়ের আলোচনা। নিজেদের শিল্পচর্চাকে যথার্থ আধুনিক বলে প্রতিষ্ঠা করতে 'কন্টেকস্টচুয়াল মডার্নিজ্‌ম' নামক যে দোআঁশলা ধারণাটি এঁরা প্রচার করবেন পরবর্তীকালে, শান্তিনিকেতনের বাতাসে কান পাতলে শোনা যায়, সেটিও বিনোদবিহারীর মস্তিস্ক প্রসূত ; শান্তিনিকেতনের মুখে মুখে ফেরা গল্পে তা প্রতিষ্ঠিত। বহুর মধ্যে থেকে দু-

[25] বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, *আধুনিক শিল্পশিক্ষা,* বিশ্বভারতী, ১৯৭২

চারজনকে বেছে নেওয়া আধুনিকতার একটি বৈশিষ্ট্য, এ কথা আমরা জানি আর এই দৃষ্টিভিঙ্গীর আধিপত্য যে শক্তিশালী পশ্চিমী সভ্যতা পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে, সে-কথাও আমাদের অজানা নয়। ফলে প্রধানত রবীন্দ্রপরবর্তী কলাভবনে শিক্ষিত এঁরাই এই সময় থেকে বিনোদবিহারী-রামকিঙ্করকে উপস্থাপিত করতে শুরু করলেন শহুরে দর্শকের সামনে। স্বাধীন ভারতে ক্রমাগত প্রচারের আলো পেতে থাকা এই শিল্পীদ্বয় তাই পরিণত বয়সে পর পর পেতে থাকেন সরকারি সম্মান : বিশ্বভারতীর প্রফেসর, ললিতকলা আকাদেমি পুরস্কার, পদ্ম পুরস্কার, দেশিকোত্তম ইত্যাদি। কলাভবনের শিক্ষা শেষ করে এই ছাত্রছাত্রীর দল একে একে যখন বিদায় নিলেন তখন শান্তিনিকেতনের মায়া ত্যাগ করা ছাড়া আর কোনও রাস্তা খোলা রইল না বিনোদবিহারীর, রামকিঙ্করের এ-সব ঝামেলা না থাকায় তিনি এখানেই রয়ে গেলেন।

বিনোদবিহারীর শান্তিনিকেতন ত্যাগের পিছনে আরেকটি কারণ বিবেচনা করাও জরুরি। যে কোনও জায়গার আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়ায় কিছু প্রমাণ-মুক্ত আখ্যান। এক মুখ থেকে আরেক কান হয়ে তারা জ্যান্ত থাকে সেকাল থেকে একালের প্রবাহে। এও সেরকমই শান্তিনিকেতনের শ্রুতিবাহিত ইতিহাসের এক গল্প। চাকরি নিয়ে তাঁর নেপাল যাওয়ার তিন-চার বছর পর নন্দলাল অবসর গ্রহণ করেন। নন্দলাল অবসর গ্রহণ করবেন, আর কেউ সেই দায়িত্ব পালন করবেন। বিনোদবিহারী শিক্ষকতার কাজের দায়িত্ব পালন করবেন কার অধীনে : বিনায়ক মাসোজি, বিশ্বরূপ বসু ? তিনি নিজে এই দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পাবেন, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই আর এই ব্যাপারটি তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনও নয়। নন্দলালের পরে কে ? শান্তিনিকেতনের জনপরিসরে যখন এই চিন্তা দানা বাঁধছে তখন প্রথমে মাসোজি ও পরে বিনোদবিহারী

আশ্রম ত্যাগ করলেন।[26] নন্দলালের পর আরেকটি নন্দলালকে পাওয়া যাবে এমন অলৌকিক ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। কিন্তু 'নন্দলালের পরে কে ?' এই প্রশ্নের একটি স্বাভাবিক উত্তর তো বিনোদবিহারী। বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী, পরিশ্রমী কর্মী, নিজের শিল্পচর্চায় মগ্ন ও চিন্তাশীল শিক্ষক - সব মিলিয়ে বিনোদবিহারীই তো ছিলেন নন্দলালের যোগ্যতম উত্তরসূরী। সেই সময় তিনি শান্তিনিকেতন ত্যাগ না করলে কলাভবন যে অন্য এক ছন্দে এগোতে পারত, এমন ভাবার সঙ্গত কারণ আছে।[27]

প্রায় দশ বছর পর কাঠমাণ্ডু, বনস্থলি, মুসৌরি, দেরাদুন, পটনা, দিল্লি হয়ে নন্দলালের জীবদ্দশাতেই ১৯৫৭ সালে বিনোদবিহারী আবার আশ্রয় নিলেন শান্তিনিকেতনে ; যোগ দিলেন শিল্প-ইতিহাসের অধ্যাপক পদে কলাভবনে। ১৯৬৬ সালে অল্প কিছুদিনের জন্য বিনোদবিহারী কলাভবন পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে কলাভবনের নতুন শিক্ষা-কাঠামো সংক্রান্ত আলোচনা ও রূপান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করেন। ১৯৬৭ সালে ৪০-এর দশকের কলাভবনের ছাত্র দিনকর কৌশিক কলাভবনের অধ্যক্ষ পদে যোগ দিয়ে সেই পরিকল্পনাটিকে সাফল্যের সঙ্গে কার্যকর করে তোলেন। ইউ জি সি-র যে-দলটি সেই সময় বিশ্বভারতী পরিদর্শন করে, তার বিশেষজ্ঞ সভ্য ছিলেন ৪০-এর দশকের কলাভবনের ছাত্র শঙ্খ চৌধুরী ; রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় তাঁর

---

[26] ''নন্দলালের পরে কে' এই প্রশ্নটি যখন থেকে কলাভবনে বা শান্তিনিকেতনে জেগে উঠেছে, তখন থেকেই যেন আগের সেই 'এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে' মনোভাবটি ক্রমশই ক্ষুন্ন হয়েছে, পালা-বদলের সন্ধিক্ষণে, কালের ধর্মে। এরই অনিবার্য পরিণতিতে প্রথমে শিল্পী বিনায়ক মাসোজি আর পরে বিনোদদাও শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে গেলেন অন্য কাজ নিয়ে।' সুখময় মিত্র, 'বিনোদদা', *Visva-Bharati News*, March-April, 1981. p. 283

[27] 'Mussoorie became his home a little later, when he left Nepal. … On another such day, with snow falling outside, I found him doing a painting of a 'Tal-Gach' and 'goru-gadi' and told him by way of joke that he was probably feeling homesick. Puffing his pipe he brooded a bit and said that it was true (Satya Katha). I have always felt since that Santiniketan was the only place for him and he should not have left it. … The story of Kala-Bhavana would have been different if, at the time of his first leaving, he could have been persuaded to stay, some way or the other.' Jitendra Kumar, 'Benode Da', *Visva-Bharati News*, March-April, 1981. p. 314

অবদান উল্লেখযোগ্য।[28] এ-ছাড়া প্রথমে উপাচার্য সুধীরঞ্জন দাস ও পরে কালিদাস ভট্টাচার্যর পূর্ণ সমর্থন ও সহায়তায় কৌশিক অনায়াসে খুব অল্প দিনের মধ্যেই কলাভবনকে একটি চিরাচরিত আর্ট কলেজে রূপান্তরিত করলেন। তিনি অবসর নেবার তিন-চার বছরের মধ্যে ১৯৮০ সালে পরিণত বয়সে কলাভবনে অধ্যাপক পদে যোগ দেন ৪০-এর দশকের কলাভবনের আরেক ছাত্র, বিনোদবিহারীর অন্যতম প্রধান শিষ্য কে জি সুব্রমন্যণ। এই ৮০-র দশকেরই দ্বিতীয়ার্ধে শিল্পী যোগেন চৌধুরী কলাভবনে অধ্যাপক পদে যোগ দেন। কলাভবনের বহিরঙ্গে এই দু'জনের প্রভাব এমন গভীর যে কলাভবনের প্রধান উৎসব নন্দন মেলা, সমাজে পরিচিত হয়ে ওঠে মা-যো (মানি-যোগেন) মেলা হিসেবে। ৩৫-৪০ বছরের দূরত্বে বসে কলাভবনের অন্তরঙ্গে এঁদের প্রভাব বিচারের সময় হয়ত এইবার জরুরি হয়ে পড়েছে।

বিনোদবিহারীর মতে, 'সাহিত্য, সমাজ, জীবনযাত্রার সকল অংশে, আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুপ্রবেশ যখন ঘটেছে সেই সময় শিল্পধারাকে এই প্রভাব থেকে রক্ষা করার ব্যর্থতা সম্বন্ধে নন্দলালের ছাত্ররাই প্রথম সচেতন হয়েছিলেন। তাঁদেরই সমর্থনে কলাভবনের নূতন পরিকল্পনা গৃহীত হয়।'[29] এই পাশ্চাত্য প্রভাবে নিজেদের জনজীবনের সকল সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ বদলে ফেলার ঔদ্ধত্বকেই এঁরা 'যুগোপযোগী' হয়ে ওঠা মনে করতেন। আর ঠিক এই কারণেই নন্দলাল রক্ষণশীল, পশ্চাদগামী ও 'যুগ-অনুপযোগী'। এই যুক্তিতে রবীন্দ্রনাথ ও মোহনদাস গান্ধীর সমকক্ষ রক্ষণশীল, পশ্চাদগামী ও 'যুগ-অনুপযোগী' মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল - নন্দলাল তো এঁদের কাছে শিশু ! ১৮৩০ সালে পরাধীন ভারতবর্ষে নূতন শিক্ষানীতি গৃহীত হ'ল, ধীর গতিতে বিকশিত হতে থাকা টি

---

[28] 'এই সময় U. G. C.র সভ্যবৃন্দ বিশ্বভারতী পরিদর্শনে আসেন। তাঁদের সঙ্গে বিশেষজ্ঞরূপে ছিলেন … নরনারায়ণ চৌধুরী (শঙ্খ চৌধুরী)। কলাভবনের নূতন পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে তুলতে হলে যে অর্থের প্রয়োজন সে সম্বন্ধে নরনারায়ণ চৌধুরী সভ্যবৃন্দকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেন এবং উপযুক্ত অর্থ পাওয়া সহজ হয়।' বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, *আধুনিক শিল্পশিক্ষা,* বিশ্বভারতী, ১৯৭২। পৃ. ১১০

[29] বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, *আধুনিক শিল্পশিক্ষা,* বিশ্বভারতী, ১৯৭২। পৃ. ১১০

বি মেকলের সেই ‘a class of persons Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect’ নীতি যখন ভারতবর্ষের শিক্ষা জগতকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে সেই সময় রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষানীতি বর্জন করার সাহস দেখালেন, প্রতিবাদস্বরূপ প্রতিষ্ঠা করলেন ভারতীয় ঐতিহ্যের (অতীতের নয়) শ্রেষ্ঠ দানের জ্ঞানচর্চাকেন্দ্র ব্রহ্মচর্যাশ্রম। গুরুগৃহে বাস করে মাতৃভাষায় শিক্ষার মাধ্যমে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার সাধনা। গান্ধীর আশ্রম প্রতিষ্ঠা নিয়েও এই একই কথা প্রযোজ্য। জওহরলাল নেহরুর আদর্শের সঙ্গে গান্ধীর জীবনদর্শনের যে দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে আমরা পরিচিত[30], স্বাধীন ভারতবর্ষে সেই দ্বন্দ্বটিই যেন প্রকাশ পেল নন্দলাল-বিনোদবিহারী দ্বন্দ্বে।

‘ইংলিস্ মিডিয়ামের ব্যাপারটা বুঝলি এবার ?’ ছেলেটির এই প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটি হাসতে হাসতে বলল, ‘এত ভজকটর মধ্যে সবই কেমন যেন আবছা হয়ে গেল।’ ‘সে কি ! আচ্ছা বেশ, আরেকটু খোলসা করার চেষ্টা করি। তোর পেসো একবার যে গল্পোটা বলেছিলেন, মনে আছে তোর ? ওঁদের পাড়ার সজনী দত্ত বিলেৎ গেলেন পড়াশুনো করতে, দেড় বছর পর ফিরে এলেন সজনে ডাঁটা হয়ে। সজনী দত্ত থেকে সজনে ডাঁটা, এই হ’ল বাংলা থেকে ইংলিস্ মিডিয়াম। পেসো ঠাট্টা করে বলেছিলেন, এই সজনে ডাঁটাদের পরবর্তী প্রজন্ম নাকি রূপান্তরিত হয়ে যায় ডাঁটার ছিবড়েতে। আর এই ছিবড়েরাই নাকি এখন দেশ চালান, সব ব্যাপারে সরকারি নীতিনির্ধারণ করেন ; বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল হন !’

---

[30] মোহনদাস গান্ধীকে লিখিত জওহরলাল নেহরুর চিঠি, ১১ জানুয়ারি ১৯২৮। Uma Iyengar, Lalitha Zackariah [Eds.] *Together They Fought*: *Gandhi-Nehru Correspondence 1921-1948*, Oxford, New Delhi, 2011. pp. 46-53 দ্রষ্টব্য।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী কলাভবন

বিশ্বভারতীর পাঠ্যক্রম-পরীক্ষাহীন আদর্শ লঙ্ঘন ক'রে শান্তিনিকেতনে কলেজ প্রতিষ্ঠা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষা-ডিগ্রি ব্যবস্থা গৃহীত ও প্রচলিত হয় ১৯২৪ সালে। শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী পর্বে রবীন্দ্রনাথকে যে একটার পর একটা আপোসের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, কলেজ প্রতিষ্ঠা তার অন্যতম। এর ফলে বিশ্বভারতীর অন্যান্য বিভাগের ওপর এক ধরনের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব আরোপিত হলেও 'নন্দলালের ব্যক্তিত্বে কলাভবনের স্বাধীনতা বহুল পরিমাণে রক্ষিত হয়েছিল।'[31] বিশ্বভারতীর অন্যান্য বিভাগ সম্পর্কে হতাশ হলেও নন্দলাল ও কলাভবনের কর্মকাণ্ডের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা আগ্রহ উৎসাহ উচ্ছ্বাস, এমনকী পক্ষপাতও প্রকাশ পেয়েছে তাঁর নানান কাজে ও লেখায়। ১৯২৩ সালে গুজরাত সফরকালে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর জন্য যে অর্থ সংগ্রহ করেন তারই একটি অংশ দিয়ে নির্মিত হয় কলাভবনের জন্য নন্দন বাড়ি। ১৯২৩ সালের ২৭ নভেম্বর পোরবন্দর থেকে রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে লিখছেন, 'কলাভবনের বাড়ি তৈরিতে খুব বেশি খরচ করা ঠিক হবেনা। এই fundএর যতটা স্থায়ী করা সম্ভব তারই চেষ্টা করা উচিত। কলাভবনে এখন যে মাসিক খরচটা হয় তার একটা পাকা সংস্থান হলে জিনিষটা চিরন্তন হয়ে থাকবে। বিশ্বভারতীর অন্য সব গেলেও ওটা মরবে না। বিশ্বভারতীর প্রত্যেক বিভাগকেই এইরকম স্বতন্ত্রভাবে স্থায়ী করে তোলবার চেষ্টা করতে হবে। তা হলে যার প্রাণ বেশি স্বাভাবিক নিয়মে সে আপনিই টিঁকে যাবে।'[32] এর প্রায় ১৩ বছর পর ১৯৩৬ সালে যতক্ষণে 'সব কিছুকে খর্ব করে একটা কলেজ সিঙ উঁচু করে দাঁড়িয়েছে', রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'ভাগ্যে আমি কাঠেবাড়ের টাকায় কলাভবনের ভিত্তি পাকা করেছিলুম নইলে আজ সে টাকা যেত

[31] বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, *আধুনিক শিল্পশিক্ষা,* বিশ্বভারতী, ১৯৭২। পৃ. ১০৫

[32] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথকে লিখিত চিঠি, *চিঠিপত্র* ২, বিশ্বভারতী। পৃ. ১০৪

কলেজের পেট ভরাতে।'[33]

রবীন্দ্রনাথ কলাভবনের বাড়ির নাম দিলেন নন্দন, অন্যান্য উপলক্ষের মত এই বাড়ি উদ্বোধনের সময়ও লিখলেন কবিতা,

হে সুন্দর, খোলো তব নন্দনের দ্বার -
মর্তের নয়নে আনো মূর্তি অমরার।
অরূপ করুক লীলা রূপের লেখায়,
দেখাও চিত্তের নৃত্য রেখায় রেখায়।[34]

কলাভবনের পূর্বোক্ত পুনরুজ্জীবনের সমর্থনে যে যুক্তি ব্যবহার করা হয়, ১৯২৪ সালে সেই রকমই এক দৃষ্টিভঙ্গী জন্ম দিয়েছিল কলেজের - সময়ের সঙ্গে তাল রাখতেই নাকি এই ব্যবস্থার প্রচলন। তাহলে রবীন্দ্রনাথকে কেন লিখতে হয়, 'বৎসরের পর বৎসর ক্রমশই সঙ্কুচিত হতে লাগল আমার আদর্শ। যে আসন বানাতে বসেছিলেম সর্বকালের অতিথির জন্যে, তা সঙ্কীর্ণ হয়ে এল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেউড়ির কাছে। সব কিছুকে খর্ব করে একটা কলেজ সিঙ উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।'[35] জীবনের শেষ দিন অবধি কলাভবন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ উৎসাহী ছিলেন, কখনও তাঁকে হতাশ হতে দেখা যায় নি। কিন্তু এ কোন কলাভবন ? এ যে বিনোদবিহারী-রামকিঙ্কর-সর্বস্ব কলাভবন নয়, সে কথা মনে করা অসঙ্গত নয় নিশ্চয়ই। তাহলে কি ধরে নেওয়া যায় না কলাভবনের ছিল আরেক প্রাণবন্ত রূপ আর এই শতবর্ষের সুযোগে সন্ধান করা উচিত সেই অন্য কলাভবনের ?

ভদ্রমহিলা এবার বলে উঠলেন আরেক অভিজ্ঞতার কথা, '১৯৭৭-৭৮ সাল, শান্তিনিকেতনে জন্মানো আমি তখন সবে পাঠভবনের পড়া শেষ

---

[33] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারুচন্দ্র দত্তকে লেখা চিঠি, ৭ জানুয়ারি, ১৯৩৬। *চতুরঙ্গ,* কার্তিক-চৈত্র ১৪১৪। পৃ. ১৪-১৫
[34] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্ফুলিঙ্গ,* ২৫৯-সংখ্যক কবিতা।
[35] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারুচন্দ্র দত্তকে লেখা চিঠি, ৭ জানুয়ারি, ১৯৩৬। *চতুরঙ্গ,* কার্তিক-চৈত্র ১৪১৪। পৃ. ১৪-১৫

করে কলাভবনে ঢুকেছি। একদিন ক্লাসে প্রাণ খুলে কাজ করছি আর গান গাইছি। ক্লাসে ঢুকেই সাত-আট বছর ‘পুনরুজ্জীবিত’ কলাভবনে মাস্টারি করা মাস্টারমশাইয়ের প্রশ্ন, “কে গান করছে ?” সঙ্গে সঙ্গে আমার সহাস্য সোজা উত্তর “আমি”। “সঙ্গীতভবনে পাঠিয়ে দেব”, “পাঠিয়ে দিন” বলে গানে আর কাজে আবার মন দিলাম। হার তো উনারই হল ; সঙ্গীতভবনে পাঠিয়ে দেবার ক্ষমতা যে ওঁর নেই, সে কথা আমার থেকে উনিই বেশি ভালো করে জানতেন। আর তাই সেদিন গোটা ক্লাসে আমার পাশে বসে আমাকেই দিয়েছিলেন সবথেকে বেশি সময়।’ কলকাতা আর্ট কলেজের মেয়েটি গম্ভীর স্বরে বলে উঠল, ‘এর সঙ্গে হারা-জেতার কোনও সম্পর্ক নেই দিদি, ওই কথাটা ভেবে আসলে আপনি নিশ্চিন্ত বোধ করেন। ব্যাটাছেলে মাস্টাররা এইসব সুযোগ কখনও ছাড়তে চাননা - এই সুযোগে তিনি কেমন সদ্য ইশকুল পাশ করা যৌবনদৃপ্ত আপনার পাশ ঘেঁষে বসবার সুযোগ করে নিলেন ? আপনাদের সময় আপনারা হয় বুঝতে পারতেন না নয় ভয়ে এ-সব কথা বলতেন না কিন্তু আজকাল আমরা এই প্রবণতা লক্ষও করি আর প্রকাশ্যে তা প্রকাশও করি। ... পুনরুজ্জীবিত করার প্রক্রিয়ায় কতদিন এই নতুন শিক্ষকগোষ্ঠী কলাভবনকে মহিলা-মাস্টারহীন করে রেখেছিলেন, মনে আছে আপনার ?’ ‘সে তুমি হয়ত ঠিকই বলেছো ভাই কিন্তু আমি আসলে তোমার বন্ধুর যুক্তির সমর্থনে আমার এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথাটা পাড়লাম। কলাভবন আর আর্ট কলেজ যে এক জিনিস নয় সে কথাটা এত স্পষ্ট করে আগে বুঝিনি, মনে হল পাশের বন্ধু যদি পেনসিল ছুলতে গিয়ে আঙুল কেটে বসত আর আমি আমার শাড়ির আঁচল দিয়ে তার সুশ্রুষা করতাম তাহলে নিশ্চয়ই তিনি আমাকে মেডিক্যাল কলেজে পাঠিয়ে দেবার হুমকি দিতেন - হায় স্পেশালাইজেশন !’ ‘বাঙলা মিডিয়াম থেকে ইংলিস্ মিডিয়াম, ভবন থেকে কলেজ - যাই হোক না কেন, কথাটা হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকলে এই কলাভবন নিয়ে তাঁর চিন্তাটা ঠিক কেমন হত।’ ছেলেটি ফিরে আসতে চায় মূল আলোচনার বিষয়ে।

'আমার শেষ বয়সের সমস্ত চেষ্টা যদি ঐ কলাভবন সঙ্গীত ভবনের উন্নতি সাধনের জন্য দিতে পারতুম তা হোলে আমি গর্বের সঙ্গে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতুম, এবং মরার আগে মনে করতুম জীবন সার্থক হয়েছে - কিন্তু এই কলেজটার জন্যে ?' **১৯৩৬** সালে যে-রবীন্দ্রনাথ কলাভবন সম্বন্ধে এই কথা লিখলেন, সেই রবীন্দ্রনাথই কি **১৯৬৭** পরবর্তী 'পুনরুজ্জীবিত' আর্ট কলেজ সম্বন্ধে এই কথা বলতে বাধ্য হতেন না যে 'অবশেষে কনস্টিট্যুশনের খাল কাটা হোলো, বেনো জল ঢুকল। কলিকাতা বিশ্ববদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী মাতব্বর লোকেরা তাদের শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে ভাঙাগড়ায় প্রবৃত্ত হলেন।'[36] ?

জানুয়ারি ২০১৯, শান্তিনিকেতন

[36] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারুচন্দ্র দত্তকে লেখা চিঠি, ৭ জানুয়ারি, ১৯৩৬। *চতুরঙ্গ*, কার্তিক-চৈত্র ১৪১৪। পৃ. ১৪-১৫